শিক্ষা ও বিজ্ঞান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পরিবেশ

মুনশী আবদুল মান্নান

১০ জুলাই, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ। আমাদের জাতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, আইন, শিল্পকলা তথা মননশীল ও সৃজনশীল যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। আজকালের অনেকেই এ দিনটির ইতিহাস, গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। এজন্যে বর্তমান প্রজন্মের মানুষ যতটা দায়ী, তার থেকে অনেক বেশী দায়ী আমাদের পূর্বসূরীরা। তাদের অমনোযোগিতা, আত্মশ্লাঘাবোধের অভাব এবং জাতীয় চেতনার উৎস ও ধারা নির্ণয়ে অক্ষমতার কারণেই জাতীয় ইতিহাসে বিস্মৃত স্মরণীয় অনেক দিনের মত ১ জুলাই-ও বিস্মৃতির অতল গহবরে হারিয়ে গেছে। ইতিহাস-বিস্মৃত জাতি হিসাবে আমাদের যে দুর্নাম আছে, ১ জুলাইকে ভুলে যাওয়ার ঘটনা তার আর একটি বড় প্রমাণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর যে কোনো একজনকে জিজ্ঞেসা করুন: 'তুমি যে বিশ্ববিদ্যলয়ের ছাত্র সে বিশ্ববিদ্যালয় কবে যাত্রা শুরু করেছিল, তুমি জান?' আমাদের দৃঢ়, বিশ্বাস, এ প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারবে না। পারবে না, কারণ এ সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নাই। যাদের এই দিনটি স্মরণ করিয়ে দেয়ার কথা, সেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত। বছরান্তে এই দিন উপলক্ষ্য করে যদি কর্তৃপক্ষ একটি সাধারণ আলোচনারও ব্যবস্থা করতে পারতেন তাহলে এই বিস্মৃতি কখনই স্পর্শ করতে পারতো না। এই নির্লিপ্ততা অন্য কথায় অবহেলা একটা মারাত্মক অপরাধের শামিল। কারণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শুধমাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় নয়, একটি জাতি একটি জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এই বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এই অঞ্চলের মানুষ, যারা এখন একটি জাতি, যে বিপুল ত্যাগ স্বীকার করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে কোনো জনগোষ্ঠী বা জাতি তা করেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আমাদের জাতি-প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সঙ্গে একীভূত। জাতীয় ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে যেমন এই বিশ্ববিদালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আপনা-আপনিই এসে যায়, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস জানতে গেলেও অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে জাতির ইতিহাস। কাজেই, এই ইতিহাস থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা, নিজেকে ভুলে যাবারই নামান্তর। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, আমাদের দেশে এমন এক শ্রেণীর রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী আছেন, যারা জাতীয় ইতিহাসকে বিকৃত করার কাজে সদা তৎপর রয়েছেন। তারা উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক উত্থান ও প্রতিষ্ঠাকে ভিন্ন চোখে দেখে থাকেন। তারা স্বাধীন বাংলাদেশের স্বতন্ত্র জাতীয়তাকে অন্য একটি স্বাধীন দেশের অঙ্গরাজ্যের ভাষাগত পরিচিতির সঙ্গে একত্র করে দিতে চান। যারা এদেশে স্বতন্ত্র জাতীয়তার কথা বলেন, অধিকাংশ মানুষের সাহিত্য-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্ম, আদর্শ ও বিশ্বাসের কথা বলেন তাদেরকে তারা প্রায়শঃই সাম্প্রদায়িক বলে গালি দিয়ে থাকেন। বলাই বাহুল্য, তাদের বক্তব্য ও আচরণের মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। যারা একদিন বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন, আন্দোলন ও ষড়যন্ত্র করে বঙ্গভঙ্গ রোধ করেছিলেন, যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় বাধা দিয়েছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' বলে অভিহিত করেছিলেন, এরা তাদেরই উত্তরসূরী। ইতিহাস তাই এদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। আসল ইতিহাস উন্মোচনের বদলে এরা ঐ ইতিহাসকে বিকৃতি করছে। যেখানে তা সম্ভব হচ্ছে না। সেখানে জাতিকে ইতিহাস থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস কিংবা এর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এদের সুপরিকল্পিত কারসাজির জন্যই আজ অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে।

যা অপর পক্ষে, দেশ ও জাতির ইতিহাসকে যারা স্বমহিমায় ও প্রকৃত চেহারায় দেখতে চান, তারা সংখ্যায় যাই থাক, অকর্মণ্য ও অলস। ইতিহাস বিস্মৃতির একটা বড় দায়ভাগ তাদেরও প্রাপ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যা এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর 'মাদার অর্গানাইজেশন', মুরব্বী ও অভিভাবক, যা একসময় খ্যাত ছিল প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে, যার ছাত্রা উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন ও বিকাশে সবচে বেশী অবদান রেখেছে, তার যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯২১ সালের ১ জুলাই থেকে। কলা, বিজ্ঞান ও আইন— এই তিনটি অনুষদে বারোটি বিভাগ নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় তার অগ্রযাত্রার সূচনা করেছিলো। বিভাগগুলো হচ্ছে, ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলা, আরবী ও ইসলামিক স্ট্যাডিজ, পার্সী ও উর্দু ইতিহাস, অর্থনীতি রাজনীতি, দর্শন, অংক, পদার্থ, রসায়ন, আইন এবং শিক্ষা। এই বারোটি বিভাগে তখন শিক্ষক ছিলেন ষাট জন। এদের মধ্যে আটাশ জন ছিলেন কলা অনুষদে, সতের জন বিজ্ঞান অনুষদে এবং পনেরো জন আইন অনুষদে। প্রথম বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল আটশ' সাতাত্তর জন। হল ছিল তিনটি— ঢাকা হল, জগন্নাথ হল ও মুসলিম হল। এই তিনটি হলে আবাসিক-অনাবাসিক ছাত্র সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ঢাকা হলে তিনশ' ছিয়াশি, জগন্নাথ হলে তিনশ' তের, এবং মুসলিম হলে একশ' আটাত্তর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সের ছিলেন মিঃ পি, জে, হার্টস। ১৯২০ সালের ১লা ডিসেম্বর তিনি কার্যভার গ্রহণ করেন। ঢাকা কলেজ ভবন ও সন্নায় বাংলা ও আসাম সরকারের রমনায় অবস্থিত পরিত্যক্ত সুরম্য ভবনগুলিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়।

সেই থেকে বিগত ছেষট্টি বছর ধরে এ অঞ্চলের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রধান পাদপীঠ হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করে আসছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রাই পর্যায়ক্রমে এ অঞ্চলের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। রাষ্ট্র, রাজনৈতিক অনেক কিছুর পরিবর্তন হলেও এখনও এ বিশ্ববিদ্যালয় দেশের দ্বিতীয় পার্লামেন্ট হিসাবে খ্যাত।

স্মরণ করা যেতে পারে, এ বিশ্ববিদ্যালয় খুব সহজে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এ অঞ্চলের মুসলিম নেতা ও জনগণের সুকঠিন ত্যাগ ও সংগ্রামের ফসল এই বিশ্ববিদ্যালয়। সাধারণতঃ পূর্ব বাংলার অবনত মুসলমান সমাজে শিক্ষার আলো বিস্তারের জন্যে উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে মুসলমান নেতৃবৃন্দের দীর্ঘদিনের দাবী, ভারতে একটি নতুন ধরনের আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তৎকালীন ভারতীয় সরকারের আগ্রহ এবং কলকাতা বিশ্ববিদালয়ের চাপ হ্রাস— এই তিনটি কারণে ঢাকা বিশ্ববিদালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে মুসলমানদের শিক্ষার দিকটিই ছিল মুখ্য। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একটি রাজনৈতিক কারণও ছিল এবং সর্ব বিবেচনায় সেটাই হচ্ছে মৌল কারণ। তৎকালীন চ্যান্সেলর ও বাংলার গভর্নর লর্ড লিন্টন ১৯২২ সালের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এই কারণটি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয় এ অঞ্চলের মুসলমানদের বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ। তার ভাষায় "It is no use recalling the days when Dacca had just ceased to be the capital of Eastern Bengal and when the late sir Rabert Nathan and his committee were busy designing the university of Dacca as a splendid Imperial compensetion."

এ কথা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানা, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গকে পূর্ব বাংলা ও আসামের মুসলমানেরা স্বাগত জানিয়ে ছিলেন। এই বিভাগের ফলে বাংলা ও আসামের মানুষের বস্তুগত ও শিক্ষাগত উন্নতি ঘটবে— এই আশা ও বিশ্বাসেই তারা সেদিন এই বিভাগকে গ্রহণ করেছিলেন প্রবল আবেগে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কায়েমী স্বার্থবাদী হিন্দুমহল এই বঙ্গ বিভাগকে নস্যাৎ করার জন্যে শুরু থেকেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, একে মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ বলে অভিহিত করে এবং বিভাগ রদের ব্যাপারে ভারত সরকারের কাছে জোর দাবী জানাতে থাকে।

এই দাবী ও আন্দোলনেরই এক পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়। এতে এ অঞ্চলের মুসলমান জনসাধারণ ও নেতৃবৃন্দ চরমভাবে আহত ও হতাশ হয়ে পড়েন। কারণ, বঙ্গভঙ্গের ফলে এ অঞ্চলের মানুষের উন্নয়ন ও অগ্রগতির যে আলোক শিখাটি জ্বলে উঠেছিল বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে তা দপ করে নিভে গেল। তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ পূর্ব—বঙ্গের মানুষের এই অসন্তোষের বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন এবং ঢাকা সফরে আসেন ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে। ৩১ জানুয়ারী নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, এ. কে, ফজলুল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সফররত ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করেন। মুসলিম নেতৃবৃন্দ অবনত মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্যে শিক্ষার গুরুত্ব কতটা তা ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন, "Eastern Bengal is wellknown till the time of partition was negleeted area. Muhammedams were Principal sufferers. This was the case especially is regards the education. It was during the days of Partition that seriows attempts were made by the Government to tevate thier exclusive attention to the needs of Eastern Bengal and its people. The annulment of the partition was therefore, looked upon with serious misgivings, especilly by the Muslim seation. For it was during these Partition days that the problem of muslim education received at the hands of Government that amount of attention which their importance justified."

মুসলিম নেতৃবৃন্দের এই প্রতিনিধিদল ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্যে ভাইসরয়ের কাছে জোর দাবী জানান। ভাইসরয় পদের দাবী ও যুক্তি স্বীকার করে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেন। সে অনুযায়ী ১৯১২ সালের ২ ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত এক ইশতেহারে ভারত সরকার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, এই সিদ্ধান্তের পরপরই সেই কায়েমী স্বার্থবাদী হিন্দুমহল আবার সোচ্চার হয়ে উঠে। ১৯১২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী ডঃ রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে একটি হিন্দু প্রতিনিধি দল ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করেন এবং বলেন, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হচ্ছে— "On internal partition of Bengel" তারা আরও বলেন, পূর্ব বঙ্গের অধিকাংশ মানুষ কৃষক, বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কোনোই উপকারে আসবে না। জবাবে ভাইসরয় ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। ফলে হিন্দু প্রতিনিধিদল হালে পানি না পেয়ে ফিরে আসেন। অবশ্য তাতে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধী আন্দোলন বা প্রচার-প্রপাগাণ্ডা থেমে যায়, তা নয়। নানাভাবে এ অপচেষ্টা অব্যাহত থাকে। এমনকি যখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ চূড়ান্ত হয়ে যায় তখনও এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে ছাত্র-শিক্ষকরা না আসে সে জন্যে ঐ মহল থেকে বলা হতে থাকে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়'। যা হোক, শেষ পর্যন্ত কোনো বিরোধিতাই আর কাজে আসে না। বিলম্বে হলেও নতুন এই বিশ্ববিদালয়ের যাত্রারম্ভ হয়।

উপসংহারে আমরা বলতে চাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলো সেই বিশ্ববিদ্যালয় যা বঙ্গভঙ্গ রদের বিনিময়ে পাওয়া এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দ বিশেষতঃ নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, এ, কে, ফজলুল হক এবং নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী প্রমুখের অক্লান্ত শ্রম, নিষ্ঠা ও সাধনার ফল। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এদেশের মানুষের অশ্রু ও ত্যাগ জড়িত। দুঃখজনক হলেও এখানে উল্লেখ করতে হচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নবাব স্যার সলিমুল্লাহ কিংবা এ, কে, ফজলুল হকের অবদানের কথা আমরা কম বেশী জানি, কিন্তু এ ব্যাপারে যার প্রচেষ্টা ও অবদান সবচে বেশী সেই নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসের মতই বিস্মৃত। তাঁর নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হল বা রাস্তার নাম পর্যন্ত নেই। এই মনীষী সম্পর্কে এই অবহেলা অনভিপ্রেত ও বেদনাদায়ক। আমরা আশা করবো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের কার্যকর ব্যবস্থা নেবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে যাদের, অবদান রয়েছে তাদের স্বীকৃতিদানের ও তাদের অবদানের যথাযথ মূল্যায়নের পদক্ষেপ নেবেন।